দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 18 APR 1993
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭

বিতর্ক ৪ ছাত্ররাজনীতি বন্ধ প্রসঙ্গে বিপক্ষে

ছাত্ররাজনীতি নয় বরং শিক্ষাপদ্ধতি পরিবর্তন এবং শিক্ষকদের রাজনীতি বন্ধ করতে হবে

দেলোয়ার হোসেন

বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররাজনীতি বন্ধ করা নিয়ে এবং ছাত্ররাজনীতি চলা নিয়ে বহু কথা বলা এবং পত্রিকার পাতায় এ নিয়ে বহু লেখালেখি হচ্ছে। কিন্তু কেন এসব লেখার অবতারণা হচ্ছে। আগে তো ছাত্ররাজনীতি বন্ধ বা চলা নিয়ে কোন কথা ওঠেনি। এখন কেন উঠছে? তার কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি। ঘন ঘন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সন্ত্রাসের কালো থাবা এমনভাবে গ্রাস করেছে যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশোনা করার যে পরিবেশ তা কি আদৌ আছে? এমন পরিবেশে পড়াশোনা করা কি আদৌ উচিত? এসকল প্রশ্নের সমাধান খোঁজা হলে আমাদেরকে এর পিছনে কি কি কারণ রয়েছে এবং কারা এর পিছনে ইন্ধন যোগাচ্ছে তা খুঁজে বের করতে হবে। নিম্নে এ সম্বন্ধে কিছু কারণ ও প্রতিকার আলোচিত হল, যার আলোকে বলতে পারব ছাত্ররাজনীতি বন্ধ করা উচিত কি না?

এক. বর্তমান বাংলাদেশে রাজনৈতিক নেতা, সরকারী আমলা, ব্যবসায়ী এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু কিছু শিক্ষক মনে করেন, আমার পিছনে যদি একটি ছাত্র সংগঠন জড়িত থাকেন এবং বেশ কিছুসংখ্যক ছাত্রকে আমার কাজে প্রত্যক্ষ ব্যবহার করতে পারি তবে উপরে ওঠার সিঁড়িটা আপনাতেই হাতের মুঠোয় এসে যাবে। যার কারণে দেখা যায়, যে-সকল ছাত্রের বিরুদ্ধে বেশী বেশী দুর্নীতির অভিযোগ ও সন্ত্রাস এবং অস্ত্র মামলা আছে তারাই ঐ সকল কর্তাব্যক্তিদের বাসায় ঘন ঘন আসা-যাওয়া করে এবং তাদের সাহায্য ও সহযোগিতায় চলাফেরা করে। সে-ক্ষেত্রে ছাত্ররাজনীতি বন্ধের উদ্যোগ না নিয়ে বরং আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে সাহায্য করা উচিত।

আর আইন প্রয়োগকারী সংস্থা যেন কোন বিশেষ রাজনৈতিক দল বা কোন সরকারী আমলা বা বেসরকারী আমলার প্রতি অনুরক্ত না হয়।

দুই. কিছু কিছু শিক্ষককে দেখা যায় তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের Teaching দেওয়ার চাইতে বেশী বেশী রাজনৈতিক সংস্পর্শে আসতে ভালবাসেন। এমনকি ক্লাস ফাঁকি দেয়ার প্রতিযোগিতায় মেতে ওঠেন। কিছু কিছু Faculty-এর শিক্ষক আছেন যেখানে ৪০ বা ৫০টি Lecture দেয়ার কথা থাকলেও সেখানে ১০/১৫ টি Lectureও দেন না। ঐ শিক্ষকগুলো রাজনৈতিক ক্ষমতাধর প্রভাববলয়ের ব্যক্তি, যাদের ভয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন, জুনিয়র শিক্ষক ও ছাত্ররা টু-শব্দটি পর্যন্ত করেন না। যদি কিছু বলা হয় তবে হিতে বিপরীত হতে পারে এমন সংশয় থাকে বলে কেউই কিছু বলেন না। আবার কিছু কিছু শিক্ষক তাদের ক্লাস ফাঁকি দেয়ার ব্যর্থতা ঢাকার জন্য পরীক্ষার আগে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে কিছু কিছু সাজেশনও দিতে থাকেন।

৩. ক্যাম্পাসে মারামারির সময় দেখা যায়, কিছু কিছু শিক্ষকের বাড়ী হতে অস্ত্র নিয়ে মারামারি করতে এবং মারামারির পরে ঐ অস্ত্র আবার ঐ শিক্ষকের কাছে জমা দিতে। অবশ্যই ঐ শিক্ষক কোন না কোন রাজনৈতিক দলের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার প্রধান বা গুরুত্বপূর্ণ পদের অধিকারী। ঐ শিক্ষকরাই মারামারির পরে বিবৃতি ও পুলিশে ধরা ছাত্রদের ছাড়িয়ে আনার জন্য তদবির করে থাকেন।

কথা হলো, শিক্ষক রাজনীতি করবেন ভাল কথা। কিন্তু জনগণের অর্থ দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত হয়, সেখানে শিক্ষকগণ রাজনীতি করলে ছাত্রদের শিক্ষিত করে গড়ে তোলার দায়িত্ব নিবে কে? অথচ শিক্ষকদের মাসিক বেতনে রাখা হয়েছে শুধুমাত্র শিক্ষাদান করার জন্য। সেক্ষেত্রে শিক্ষাদানে ফাঁকি দিয়ে শিক্ষক যে টাকা নিয়ে সংসার চালাচ্ছেন তা কি অবৈধ নয়?

৪. বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচাইতে ঘৃণিত আইন হলো শিক্ষকদের বছরভিত্তিক প্রমোশন। তিন বছর পার হলেই Auto প্রমোশনে সহকারী অধ্যাপক, এমনিভাবে সহযোগী অধ্যাপক। শুধুমাত্র অধ্যাপক হতে একটি বিদেশী ডিগ্রী বা আন্তর্জাতিক জার্নাল প্রয়োজন। এ নিয়ম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মাঝে পড়াশোনা করার প্রবণতা ব্যাপক হারে হ্রাস পেয়েছে। এমনকি ক্লাসে শিক্ষকদের মুখেও তা শুনতে পাওয়া যায়। ''আমরা ক্লাস নেই আর না নেই, পড়াশোনা করি আর না করি এবং তোমরা পড়াশোনা কর আর না কর আমাদের প্রমোশন হবেই।'' অনেক শিক্ষকই আগের মতো ক্লাস নিতে আনন্দ পান না। ভাবখানা যেন বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকলেই মঙ্গল। দশ-পনের বছর কিংবা তারও বেশি পুরাতন নোট নিয়ে এসে তা দেখে ব্লাক বোর্ডে উঠানোই মনে হয় তাদের কাজ। কিছু কিছু শিক্ষকের পুরাতন নোটের কাগজগুলো এমন যে দেখলে কষ্ট হয়! কখন যে ছিঁড়ে বাতাসে উড়ে যায়...। যার ফলে ছাত্রদের মাঝে এ পুরাতন নোট যোগাড় করার একটি প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। সারা বছর পড়াশোনা না করে এদিক-ওদিক ঘুরে, মস্তানি করে, বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে পরীক্ষা এলেই এদের শুরু হয় নোট যোগাড় করার এবং Xerox করার প্রতিযোগিতা। অনেক Facultyতেই পড়াশোনার কোন নতুনত্ব নাই। গতানুগতিক প্রশ্ন করা এবং ঐ প্রশ্নগুলোর উত্তর বড় ভাইদের কাছ হতে যোগাড় করে পরীক্ষা দেয়াই মনে হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা। এ শিক্ষাপদ্ধতি অচিরেই বাতিল করা উচিত। Research পদ্ধতি চালু করতে হবে, যাতে করে ছাত্ররা কিছু শিখতে পারে এবং পড়াশোনা নিয়েই যেন সবসময় ব্যস্ত থাকতে পারে। এ পদ্ধতিতে ছাত্রদের সাথে শিক্ষকদেরও সবসময় সংশ্লিষ্ট থাকতে হয় গাইডেন্স হিসাবে। এতে শিক্ষকদের রাজনীতি করার প্রবণতাও কিছু কমবে। আর শিক্ষকদের প্রমোশন অবশ্যই আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত জার্নাল ও বিদেশী ডিগ্রী Teaching Capacity, বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থিতির পরিমাণ- এসবের উপর বিবেচনা করে দেয়া উচিত।

৫. বিশ্ববিদ্যালয়ে Termwise পরীক্ষা পদ্ধতি চালু করতে হবে, যাতে সাপ্তাহে অন্তত একটি পরীক্ষা থাকে এবং ঐ পরীক্ষা অবশ্যই সংশ্লিষ্ট ছাত্রের পঠিত বিষয়ের যে কোন একটি হতে হবে। ঐ পরীক্ষাগুলোর উপর অবশ্যই ৫ কিংবা ১০ নম্বরের হতে হবে, যা কিনা ফাইনাল নম্বরের সাথে যোগ হবে তবে শিক্ষকদের অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে, এমন কোন বোঝা চাপিয়ে দেয়া উচিত নয় যাতে ছাত্ররা ঐ পরীক্ষার প্রতি ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে যায়। ছাত্ররা যেন মনে না করেন যে, তাদের Division নষ্ট করার জন্যই এই পরীক্ষাপদ্ধতি চালু করে শিক্ষকরা ছাত্রদের উপর প্রভাব খাটানোর একটা ব্যবস্থা করেছেন। আর কর্তৃপক্ষ ও পরীক্ষা নিয়ন্ত্রককে অবশ্যই বছরের প্রথম থেকে পরীক্ষার রুটিন ও সময়সূচী নির্ধারণ করে দিতে হবে এবং কোন অবস্থাতেই পরীক্ষা পিছানো যাবে না। শিক্ষকদেরকে কড়াকড়ি নির্দেশ দিতে হবে যেন নির্ধারিত সময়ে সিলেবাস শেষ করেন। যদি কোন শিক্ষক নির্ধারিত সময়ে সিলেবাস শেষ করতে না পারেন, তবে ঐ শিক্ষকের উপর কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা নিতে হবে। সিলেবাস শেষ হল না কেন- এ নিয়ে ছাত্ররা যেন আন্দোলন করার কোন সুযোগ না পায়। ছাত্ররা কোন অজুহাত পেলেই আন্দোলন করার একটা ইস্যু তৈরী করে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি অস্থিতিশীল করে তোলে। তাই পরীক্ষা নিয়ন্ত্রককে এমনভাবে সময় নির্ধারণ করে দিতে হবে যাতে শিক্ষক তার সিলেবাস শেষ করার পর্যাপ্ত সময় পান। শিক্ষক যেন বলতে না পারেন আমাকে পর্যাপ্ত সময় দেয়া হয়নি। কি করে সিলেবাস ছাত্রদের উপর প্রচণ্ড চাপ পড়ে এবং শিক্ষকও কোনখিচুরি করে সিলেবাস শেষ করার পাঁয়তারা করেন। এ-রকম কোন সুযোগই কোন শিক্ষককে দেয়া উচিত নয়।

৬. বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদেরকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হল- (ক) S. S. C. এবং H. S. C. উভয় পরীক্ষায় কমপক্ষে ৫০% এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি পরীক্ষায় ৪৫%-এর কম পেলে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন বছরে একবার ফেল করলে বা বিরতি দিলে ঐ ছাত্র আর বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবনে রাজনীতি করতে পারবে না। কারণ লক্ষ্য করা যায়, যারা সন্ত্রাসের সাথে জড়িত তারা পাস করার চাইতে ফেল করে করে ছয় বছর অনার্সে এবং দুই বছর মাস্টার্সে থাকতেই বেশী পছন্দ করে।

(খ) কোন ছাত্র প্রথমবার কোন একটি বিষয়ে মাস্টার্স পাস করলে তিনি আর বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনীতি করতে পারবে না- ঐ ছাত্র আরো অধিক বিষয়ে পড়াশোনা করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে যত বছরই থাকুক না কেন। কারণ এতে নেতৃত্বের কোন্দল বাধে এবং জুনিয়র ছাত্ররা নেতৃত্ব পাওয়ার জন্য অভ্যন্তরীণ কোন্দল বাধিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ বিনষ্ট করে।

গ) বিশ্ববিদ্যালয়ের সিটেররাজনীতি বন্ধ করতে হবে। প্রভোস্টদের বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিতে হবে, যাতে করে সিট পাওয়ার যোগ্য ছাত্র সিট পায় এবং অযোগ্য ছাত্র সিট না পায়। সবগুলো হলে সিট বন্টনের নিয়ম একই রকম হতে হবে। দেখা যায়, একেক হলে একেক নিয়ম প্রচলিত সিট বন্টনের ক্ষেত্রে। এ-রকম বিভিন্ন নিয়ম বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতির জন্য চরম হুমকি স্বরূপ। ওভার রেসিডেন্ট প্রথা বিলোপ করতে হবে। কারণ এতে দুর্নীতি বেড়ে যায়। যেমন- রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রাক্তন প্রভোস্ট অবৈধভাবে ৪৮ জন ছাত্রকে ওভার রেসিডেন্ট করিয়ে প্রশাসনিক কাজে ও ছাত্রদের মাঝে বেশ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছিলেন। যোগ্যতাবলে যে ছেলে সিট পাবে এবং যে রুমে সে এলট পাবে তার দখল অবশ্যই হল কর্তৃপক্ষকে নিশ্চিত করতে হবে। যদি এ-কাজে কোন কোন রাজনৈতিক দল কোনরূপ বাধা প্রদান করে তবে ঐ দলকে ঐ হলে রাজনীতি করার অনুমতি বন্ধ করে দিতে হবে এবং কোন ছাত্র বাধা প্রয়োগ করলে তাকে ৭ দিনের সময় দিয়ে হল হতে বহিষ্কার করতে হবে। এ-কাজে কোনরকম দুর্বলতা প্রকাশ করা যাবে না। যদি হল কর্তৃপক্ষ দুর্নীতির আশ্রয় নেয় তবে তৎক্ষণাৎ তার তদন্ত করে বিচার করতে হবে এবং এ-কাজে কোন অবস্থাতেই এক দিনের বেশী সময় দেয়া যাবে না।

ঘ) বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস ও হলে কোন অবস্থাতেই একদল অন্য দলকে আক্রমণ বা উস্কানিমূলক কোন বক্তৃতা দিতে পারবে না। শুধুমাত্র তার নিজের দলের আদর্শ ব্যাখ্যা করে বক্তৃতা ও বিবৃতি দিতে পারবে। যদি কোন দল এ সীমা লংঘন করে তবে তাৎক্ষণিক তার ব্যবস্থা নিতে হবে।

ঙ) বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি, প্রো-ভিসি, প্রক্টর, ছাত্র উপদেষ্টা ও প্রভোস্ট যাদেরকেই নিয়োগ দেয়া হোক না কেন অবশ্যই তাকে নিরপেক্ষ ব্যক্তি হতে হবে। কোন রাজনৈতিক দলের সাথে কোনরূপ সম্পর্ক থাকলে তিনি ঐ পদগুলোর জন্য অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। কারণ সেক্ষেত্রে প্রশাসনিক কাজে দুর্নীতি প্রশ্রয় পেতেই পারে। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ নষ্ট হতেই পারে।